মহান মে দিবস স্মরণিকা ২০১৭

মে দিবসের চেতনা
হার না মানা

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স প্রকাশিত বিশেষ সংকলন
প্রকাশকাল: ১ মে ২০১৭

সম্পাদকীয়

মহান মে দিবস, দিনপঞ্জিকার নিছক একটি দিন নয়। বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি জনগণের ঐক্য, সংহতি, সংগ্রাম ও বিজয়ের মধ্যে দিয়ে রচিত হয় ইতিহাসের এই দিনটি। মুনাফালোভী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমানবিক নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অব্যাহত সংগ্রামের স্মারক মহান মে দিবস। শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকের ঐতিহাসিক বিজয়ের এই দৃষ্টান্ত যুগের পর যুগ সারা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণকে আন্দোলন-সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। আর তাই শ্রমিকদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 'মে দিবস' লাভ করেছে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীনতা।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাবে বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শ্রমজীবী জনগণ যখন বহুমুখী সংকটে জর্জরিত এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার কঠিন সংগ্রামে রত তখন মহান মে দিবস তার মুল শিক্ষা ও চেতনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে আজও আমাদের দেশে মহান মে দিবসের চেতনা এবং শিক্ষার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না। যে কর্মঘন্টা, ন্যায্য মজুরির দাবিতে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল বহু বছরের প্রেরিক্রমায় আজও সেই অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, মজুরি বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা বিদ্যমান। কারখানার দুর্ঘটনায় নামমাত্র তদন্ত, নেই কোন সুবিচার। শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে যথাযথ চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি হতে।

বেশি দিন হয়নি,বছরের শুরতেই ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই বাস্তবতাকে। নিয়মানুযায়ী গ্র্যাচুইটি না পাওয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ছুটি না পাওয়া, বিনা বেতনে ছুটি এবং বিনা কারণে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে জানুয়ারি মাসে আশুলিয়া এলাকার গার্মেন্টসে কর্মরত শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে। ফলস্বরূপ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে মালিকপক্ষ বন্ধ ঘোষণা করে ৫৯ টি কারখানা, ১৫০০ শ্রমিকের নামে ফৌজদারি মামলা হয়, ২০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয় এবং বহু শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই আন্দোলনের রেশ কাটতে না কাটতেই ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে দুইজন পরিবহন শ্রমিককে আদালতের দেয়া রায়ের প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেয় পরিবহন শ্রমিকরা। আমাদের দেশের পরিবহন শ্রমিকদের কর্মঘন্টা এবং কর্মপরিবেশ বর্ণনার অতীত। কর্মঘন্টার বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা সহ শ্রমিকেরা শারীরিক, মানসিক ও অসংখ্য সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

তবে আমরা আশাবাদী, অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসবেই, মে দিবসের অম্লান ইতিহাস ও শিক্ষা অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্ব তথা এদশের মেহনতি জনগণকে ন্যায্য দাবী আদায়ের সকল প্রয়াসে উদ্দীপনা যুগিয়ে যাবে। শ্রমজীবী জনগণের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, কাজের অধিকার, ন্যায্য মজুরি সহ সকল অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। শুধু একদিনের জন্য নয়, ৩৬৫ দিনই শ্রমিকদেরকে মে দিবসের শিক্ষা ও চেতনায় উজ্জীবিত করে শ্রমিক আন্দোলনকে অব্যহত রাখতে বিল্‌স সহযোগিতা করে যাবে মহান মে দিবসে এটাই বিল্‌সের অঙ্গীকার।

সবাইকে জানাই মহান মে দিবসের সংগ্রামী শুভেচ্ছা।

চেয়ারম্যানের বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, যা যুগে যুগে শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সমাজের কাছে মহান মে দিবস যে কোন ধরণের নিপীড়ণ-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। বর্ষ পরিক্রমায় এই দিনটি আমাদের কাছে আবারো ফিরে এসেছে। স্মরণ করছি ১৮৮৬ সালের শিকাগোর শোকবহ ঘটনা যেখানে একদল আত্মত্যাগী শ্রমিক তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সূচনালগ্ন রচনা করে গেছেন। তবে মে দিবসের আগমন ঘটে শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে। যুদ্ধ আর বিশ্বায়নের বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষিত হচ্ছে? তৃতীয় বিশ্বে তো বটেই উন্নত বিশ্বেও আজ শ্রমজীবী মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে নানাবিধ বঞ্চনা। এ অবস্থার প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংহতি প্রয়োজন। শ্রমিক সমাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে এটাই প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে বিভিন্ন দল ও মতের মহামিলন ঘটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবন মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিল্‌স। অদূর ভবিষ্যতে বিল্‌স দেশের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো ব্যাপক ও মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে সেই প্রত্যাশায় এবং শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের সার্বিক সফলতা কামনা করে সবাইকে জানাই মহান মে দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ
চেয়ারম্যান

মহাসচিবের বাণী

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাসে এক চীর ভাস্বর দিন মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে হে মার্কেটে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকের ৮ ঘন্টা কাজের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার স্মৃতি শ্রমজীবী মানুষ তথা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে চির অম্লান হয়ে থাকবে। শিকাগোর ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পরে মহান মে দিবস উদ্‌যাপনের দীর্ঘ ঐতিহ্য শুধু শ্রমিক সমাজ ও মেহনতি মানুষের অধিকার সচেতনে ঐক্যবদ্ধ ও দাবি আদায়ে সক্ষমই হয়নি, বরং এর ফলে শোষণ ও বঞ্চনার অবসানও ঘটিয়েছে অনেকখানি। শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ যে উৎপাদনের বড় শক্তি ও হাতিয়ার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশ ও সমৃদ্ধি এ শক্তির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভলশীল। এছাড়া সংগ্রামী ও মেহনতি মানুষ যে শক্তি হিসাবে বিরাট- এ উপলব্ধি সৃষ্টিতে এবং স্বীকৃতি অর্জনেও ঐতিহাসিক মে দিবসের অবদান অনেকখানি। শ্রমিক সমাজ ও মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে ও তাদের কল্যাণে দেশে দেশে যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার পিছনেও মে দিবসের ঐতিহাসিক ঘটনা ও তার সাফল্যের অবদান কম নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বার্থ আদায় ও সেটা সংরক্ষণের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন, তেমনি এসকল অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে তাদেরও উদার ও অনুকুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মহান মে দিবস প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার শিক্ষা দেয়। মে দিবসের মহান আদর্শের কথা স্মরণ রেখে ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শ্রমিক সমাজ ও মেহনতি মানুষ এবং কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষ থেকে সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণ করলেই আর কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না, উৎপাদন অব্যাহত থাকবে এবং জাতীর পক্ষে এটাই কল্যাণকর হবে। সকলকে জানাই মে দিবসের শুভেচ্ছা।

নজরুল ইসলাম খান
মহাসচিব

মহান মে দিবস

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

কর্মঘন্টাকে আট ঘন্টায় নামিয়ে আনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মে দিবসের জন্ম কাহিনী। মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই আন্দোলনের সূচনা। গোড়ার দিকে যদিও মজুরি বাড়ানোর দাবীতেই আন্দোলন শুরু হয়। ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় জুতা শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করে তখন তাদের কর্মঘন্টা ছিল প্রতিদিন প্রায় ২০ ঘন্টা। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কর্মঘন্টা কমাবার জন্য অসংখ্য ধর্মঘট হয়। ১৮২৭ সালে দৈনিক দশ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার দাবীতে মেকানিকদের উদ্যোগে ফিলাডেলফিয়ায় গঠিত হয় বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯৫০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার উদ্দীপনা বাড়তে থাকে।

১৮৬৬ সালে বাল্টিমোরে ষাটটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শ্রমিক ফেডারেশন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন', যা সে বছরই দৈনিক আট ঘন্টা কাজের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। একই বছর ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল এর জেনেভা কংগ্রেসেও প্রস্তাবটি গৃহিত হয়।

১৮৮৪ সালে আট ঘন্টা কাজের দাবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় আন্দোলন, যার সঙ্গে মে দিবসের জন্ম সরাসরি জড়িত। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ১ মে তারিখ থেকে দৈনিক আট ঘন্টা কাজের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আন্দোলন গড়ে তোলে। সে বছর আট ঘন্টা কাজের দাবীতে সকল শ্রমিক ধর্মঘট করে বের হয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মঘটের কেন্দ্র ছিল শিকাগো।

অগাস্ট স্পাইস

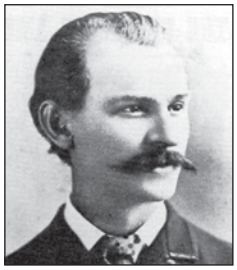

আলবার্ট পার্সনস্

১৮৮৬ সালের ১ মে তারিখে শিকাগোতে শ্রমিকদের এক বিশাল সমাবেশ হয়। আন্দোলনের ডাকে সকল শ্রমিক কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর আ গে শ্রেণী সংহতি প্রকাশের এত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর দেখা যায় নি। সে দিন আট ঘন্টা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

৩ মে শিকাগোর ম্যাককর্মিক ফসল কাটার কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমাবেশের ওপর পুলিশের আক্রমনে নিহত হন চার শ্রমিক। পরদিন হে মার্কেটে এর প্রতিবাদে সমাবেশস্থলে অজ্ঞাতনামা কারও বোমার আঘাতে এক পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যু, এরপর লড়াইয়ে আরও চার শ্রমিক আর সাত পুলিশের মৃত্যুতে উন্মাদ হয়ে ওঠে পুলিশ বাহিনী। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হে মার্কেট চত্বর রক্তে রঞ্জিত করে। এরপর প্রহসনের বিচারে ফাঁসির মঞ্চে নির্বিচারে প্রাণ দেন সংগ্রামী শ্রমিক নেতারা। জন্ম হয় এক মহান বিপ্লবের।

মে দিবসকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি দিবস হিসেবে উন্নীত করার পেছনে সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল এর রয়েছে অনন্য অবদান। ১৮৮৯ সালে সংগঠনটির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। ঐ কংগ্রেসেই ১ মে তারিখটিকে বিশেষ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়, যা প্রতি বছরই শ্রমজীবী মানুষের একটি মহান দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ

আমেরিকার শিকাগো শহরের শহীদ শ্রমিকদের অনুপ্রেরনায় ভারতবর্ষেও দাবি আদায়ে ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রেল, চা বাগান ও স্টিমার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংহতি ব্রিটিশদের কাঁপিয়ে তোলে ১৯২০ সালের দিকে। পরবর্তীকালে সুতাকলসহ বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। ঐ সময় গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ পালনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ওই সময় অধিকাংশস্থানে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় গোপনে গোপনে মে দিবস পালিত হয়।

এই উপমহাদেশে প্রথম মে দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয় মাদ্রাজে ১৯২৩ সালে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়া। তৎকালীন বাংলার শিল্পকেন্দ্র কলকাতায় সর্বপ্রথম মহান মে দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় ১৯২৭

সালে। একই সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশে মে দিবস পালিত হয়।

১৯৩৮ সালে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালনের খবর পাওয়া যায়। দাবী আদায়ের জন্য পরবর্তী কোন কোন বছর মে দিবসে ধর্মঘট পালিত হয়। মে দিবসে ছুটি দেওয়ার দাবী উত্থাপিত হয় সর্বত্র। পুরো পাকিস্তান আমল ঐক্যবদ্ধ ও পৃথক পৃথকভাবে প্রতিবছর উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে মে দিবস পালিত হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামসহ অন্যান্য আন্দোলনে অংশগ্রহনের মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিকরা প্রমান করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আইন করে বা নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না । ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার নিজস্ব গতিতে চলে।

মে দিবস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

মহান মে দিবসের আন্দোলনের একশ'একত্রিশ বছর পূর্তি হল। এ সময়ে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানষের সামাজিক অগ্রযাত্রায় অনেক অর্জন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আজ স্বীকৃত মানবাধিকার। মে দিবসের প্রধান দাবী আট ঘন্টা কাজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আইন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং শ্রমিকের মৌলিক অধিকার, যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রম আইনে শ্রমিকের আট ঘন্টা কাজ, বিশ্রাম, ছুটিসহ অন্যান্য অধিকারকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা ছিল মে দিবসের আন্দোলনকারী শ্রমিকগণের প্রধান দাবী।

কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, এত সব অর্জনের পরেও সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে এখনও অনেক পথ বাকি আছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে এমন অনেক পেশা রয়েছে যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এখনও মে দিবসের পূর্বের জমানায় রয়ে গেছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা :

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে শ্রমিকদের নির্যাতন আর বঞ্চনার কথা। শ্রমিকদেরকে গার্মেন্টেস এর ভেতরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়া, অবর্ণনীয় কষ্টকর পরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করতে বাধ্য করা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে রেখে শ্রমিকদেরকে খাটানো, নিয়োগপত্রহীন এবং বাঁচার মত মজুরী ব্যতীত ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা বাধ্যতামুলক ওভারটাইম করানো হয়। শ্রমিক মরছে আগুনে পুড়ে বা পদদলিত হয়ে বা বিল্ডিং ভেঙ্গে - একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কেন? কারণ এই সব ঘটনার পেছনে যারা আছেন, তাদের কোন বিচার বা দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি নেই। ২০০৫ সালের ১১ এপ্রিল সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ভবন ধসে প্রায় ৮০ জন মারা যায়। ভবন ধসের ঘটনায় হাইকোর্টের জারি করা রুলের জবাব মেলেনি। ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশন লিমিটেডের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত হয় ১১১ জন শ্রমিক, আহত হয় হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে অনেককেই। কিন্তু আজও বিচার মেলেনি মালিকপক্ষের কারো। ২০১৩ সালের এপ্রিলে ঘটে সাভার ট্রাজেডি নামে পরিচিত রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, যে

দুর্ঘটনায় ভবন ধসে নিহত হয় ১১৩৫ শ্রমিক এবং আহত হয়ে সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন হাজার হাজার শ্রমিক, শুধু তাই নয় মানসিক ভারসম্য হারিয়েছেন অনেকেই। এই অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির নেই কোন পরিসীমা। সর্বশেষ টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই চিত্র।

২০১৬ সালের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ২৪৯ এবং আহত হয়েছে ৫৭ জন। নির্মাণ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছে ৮৫ জন এবং আহত হয়েছে ৯৭ জন। মৎস্য ক্ষেত্রে শ্রমিক নিহত হয়েছে ৫২ জন এবং আহত হয়েছে ১৯ জন। তৈরি পোষাক শিল্পে নিহত হয়েছে ৯ জন এবং আহত হয়েছে ২০৬ জন। রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গৃহশ্রমিক নিহত হয়েছে ৯ জন এবং আহত হয়েছে ২ জন। নিহত দিনমজুরের সংখ্যা ৩৮ এবং আহত হয়েছে ৫২ জন। এছাড়া ফয়েল এবং প্যাকেজিং ক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৩৯ এবং আহত হয়েছে ৪০ জন। আলোচিত এই কয়েকটি ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হয়েছে ৬৯৯ জন এবং আহত হয়েছে ৭০৩ জন।

সেক্টর ভিত্তিক কর্মঘন্টা ও মজুরী

১৮৮৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে পহেলা মে ২০১৭ হবে আর্ন্তজাতিক শ্রম দিবসের ১৩১ তম বছর। মহান মে দিবস ২০১৭ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স নিরাপত্তা কর্মী পরিবহন খাত, হোটেল/রেঁস্তোরা, রি-রোলিং মিল ও হাসপাতাল/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার এই পাঁচটি প্রচলিত বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গবেষনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সংশিষ্ট খাতসমূহে মে দিবসের মূল চেতনা বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

১. নিরাপত্তাকর্মী

দেশে সর্বোমোট ৩৫০ থেকে ৪০০ টি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে ৩ লক্ষাধিক নিরাপত্তাকর্মী কর্মরত আছে। নব্বই[১] শতাংশের (৯২%) উপরে পুরুষ নিরাপত্তাকর্মী এবং এক-দশমাংশের (৮%) কাছাকাছি মহিলা নিরাপত্তাকর্মী। জরীপে দেখা যায়, পাঁচ শতাংশের (৪%) মত আঠারো এর কম বয়সি নিরাপত্তাকর্মী। বেশীর ভাগ নিরাপত্তাকর্মীর (৮২%) পড়াশুনা দশম শ্রেণীর নিচে। তবে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৮%) এসএসসি পাশ বা তারও উপরে পড়াশুনা করেছেন।

পঞ্চাশ শতাংশের বেশী (৫৮%) নিরাপত্তা কর্মীর কোন নিয়োগপত্র নেই। আশি শতাংশ (৮০%) নিরাপত্তা কর্মী দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ নিরাপত্তা কর্মী (৪৮%) দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) দৈনিক পনের (১৫) ঘন্টার বেশী কাজ করেন। পঞ্চাশ (৫০%) শতাংশ নিরাপত্তাকর্মী কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিরাপত্তাকর্মীর (৬৬%) সাপ্তাহিক ছুটি নেই এবং আশি শতাংশের বেশী (৮৮%) মে দিবসে ও স্বাভাবিক সরকারী ছুটির দিনে (৮৬%) কাজ করেন। ছুটি পেলে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৬৪%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (২২%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (৪%), এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সারেন (৪%)। নিরাপত্তাকর্মীরা মাসিক ভাবে মজুরী পান। আশি শতাংশের বেশী নিরাপত্তাকর্মীর (৮২%) মাসিক মজুরী দশ হাজার (১০,০০০) টাকা বা তার উপরে। নিরাপত্তা কর্মীদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

---

১ *দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট ২৪ জুলাই, ২০১৬*

২. পরিবহন (দুরপাল্লা)

বিআরটিএ নিবন্ধিত দুরপালার গণ পরিবহনের সংখ্যা ৪০৯৩৫। সংশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রচলিত হিসাবসমূহ আমলে নিয়ে অনুমান করা যায়, আরো প্রায় ৫০০০ টি অনিবন্ধিত দুরপালার গণ পরিবহন রয়েছে। প্রতিটি পরিবহনে ৩ জন (ড্রাইভার + সুপারভাইজার + সহকারী) সরাসরি নিয়োজিত এবং যাত্রা শুরু ও বিরতির জায়গায় প্রতি ১০ টি পরিবহনের জন্য ৫ জন করে ১০ জন কর্মরত সহায়ক শ্রমিক ধরলে দুরপালার গণ পরিবহনে সর্বমোট ১৮৩,৭৪০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে বলে অনুমিত হয়। পরিবহন খাতের একশ (১০০%) শতাংশই পুরুষ শ্রমিক। পাঁচ শতাংশের (৪%) মত আঠারো এর কম বয়সি শ্রমিক লক্ষ্য করা যায়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের (৬৪%) পড়াশুনা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বা তার নীচে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) শ্রমিক ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

পরিবহন খাতের শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। সকল শ্রমিক (১০০%) দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক (৪৬%) দৈনিক পনের ঘন্টার বেশী কাজ করেন। তাছাড়া, এক-তৃতীয়াংশের বেশী শ্রমিক (৪০%) দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ (১৩-১৪) ঘন্টা কাজ করেন। এক-পঞ্চমাংশ (২০%) পরিবহন শ্রমিক কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। নব্বই শতাংশের বেশী পরিবহন শ্রমিকের সাপ্তাহিক (৯০%) বা সরকারী ছুটি (৯৮%) নেই। আশি শতাংশের বেশী (৮৪%) শ্রমিক মে দিবসে কাজ করেন। আকস্মিক ছুটি পেলে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৪৮%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (১৬%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (১০%), সিনেমা দেখেন (১০%), কিংবা একটু ঘুমিয়ে নেন (১২%)। পরিবহন শ্রমিকরা সাধারনত (৯৪%) চুক্তি ভিত্তিতে মজুরী আয় করেন। মাসিক মজুরী গড়ে দশ হাজার টাকা (১০,০০০) থেকে বিশ হাজার (২০,০০০) টাকার মধ্যে (৯২%)। নব্বই শতাংশের বেশী (৯২%) শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত।

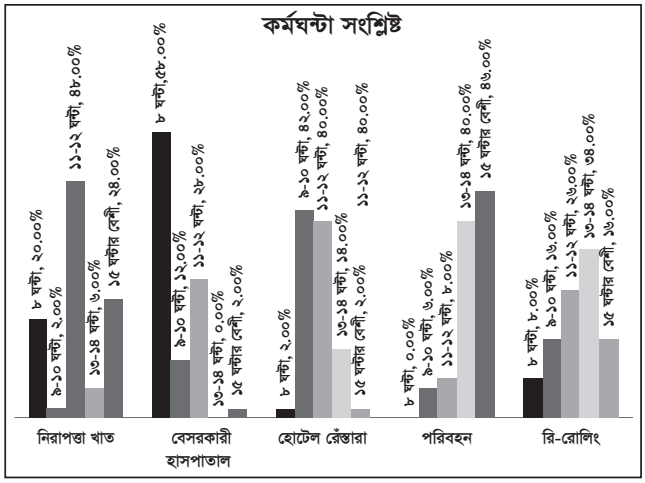

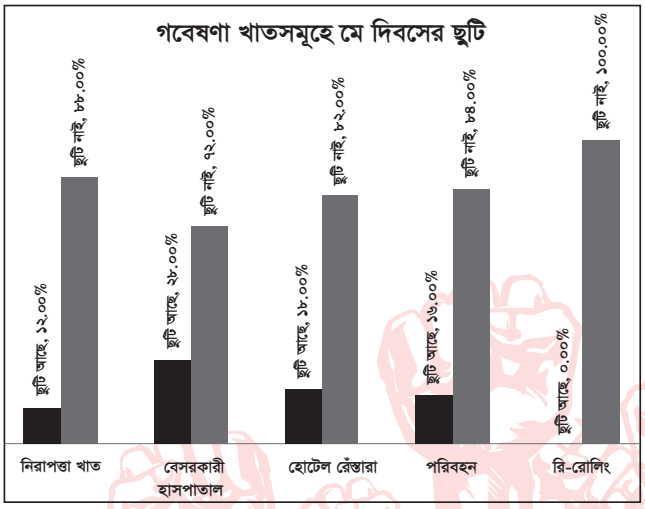

৩. হোটেল/রেস্তোঁরা

ছোট, মাঝারী ও বড় সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে আনুমানিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হোটেল/রেঁস্তোরা আছে।[২] এসকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৯ লক্ষের অধিক।[৩] জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, এক-পঞ্চমাংশের (২২%) কাছাকাছি নারী শ্রমিক। তাছাড়া, পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি (৬%) আঠারোর কম বয়সী শ্রমিক রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের (৪৪%) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

নব্বই শতাংশ (৯০%) শ্রমিকের কোন নিয়োগপত্র নেই। তবে, এক-দশমাংশ (১০%) শ্রমিকের নিয়োগপত্র আছে। প্রায় সকল (৯৮%) শ্রমিক

২ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হোটেল রেস্টুরেন্ট ফেডারেশন
৩ বিবিএস-২০১৩

দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। এক-তৃতীয়াংশের (৪২%) বেশী শ্রমিক দৈনিক নয় থেকে দশ (৯-১০) ঘন্টা কাজ করে, এক-তৃতীয়াংশের (৪০%) বেশী দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করে এবং এক-সপ্তমাংশের (১৪%) কাছাকাছি দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ (১৩-১৪) ঘন্টা কাজ করে। এক-চতুর্থাংশের (২৬%) বেশী হোটেল/রেস্তোঁরা শ্রমিক কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। আশি শতাংশের বেশী শ্রমিকের সাপ্তাহিক (৮৬%) কিংবা সরকারী ছুটি (৮২%) নেই এবং তারা মে দিবসেও (৮২%) কাজ করেন। ছুটি পেলে তারা সিনেমা দেখেন (৩৬%), পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৩৬%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (১৬%), কিংবা একটু ঘুমিয়ে নেন (৬%)।

শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী (৩৪%) দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী আয় করেন। নব্বই শতাংশ (৯০%) শ্রমিকের মাসিক মজুরী সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে সতের হাজার পাঁচশত টাকার মধ্যে। এক-চতুর্থাংশের (২৮%) বেশী মাসিক সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে দশ হাজার টাকা মজুরী আয় করেন, এক-পঞ্চমাংশের (২২%) সামান্য বেশী মাসিক দশ হাজার এক টাকা থেকে বার হাজার পাঁচশত টাকা মজুরী পান এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) মাসিক বার হাজার পাঁচশত এক টাকা থেকে পনের হাজার টাকা মজুরী আয় করেন।

এ খাতের পাঁচ শতাংশের (৪%) কম শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত।

৪. রি-রোলিং

ম্যানুয়েল, আধা স্বয়ংক্রিয় এবং পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মিলে দেশে বর্তমানে আনুমানিক তিনশটি রি-রোলিং কারখানা আছে।[৪] নব্বই শতাংশের উপর ম্যানুয়েল ও আধা স্বয়ংক্রিয় কারখানা। প্রতিটি কারখানায় গড়ে তিনশ' জন শ্রমিক ধরলে তিনশ' টি কারখানায় আনুমানিক নব্বই হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে। রি-রোলিং খাতে কোন নারী শ্রমিক পাওয়া যায় নি। তবে জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া, ডেপুটি ইন্সপেক্টর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর তথ্য মতে কারখানা পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নিম্ন প্রবৃত্তিমূলক কাজে পাঁচ শতাংশের মত নারী শ্রমিক আছে। কারখানাসমূহ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এ দুটি বৃহৎ জোনে বিভক্ত। শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী, পোস্তগোলা, ফতুলা, চাষারা, সিদ্দিরগঞ্জ, মুন্সিখোলা, এবং পাগলায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেখানে প্রায় সবই ম্যানুয়েল ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রি-রোলিং কারখানা। এখানেই জরীপটি পরিচালনা করা হয়।

রি-রোলিং কারখানার শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। ম্যানুয়েল ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রি-রোলিং কারখানায় ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লৌহ পদার্থ গলানো হয়। শ্রমিকদেরকে সর্বনিম্ন ৬৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই এখানে প্রথাগত কর্মঘন্টার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ একজন শ্রমিকের জন্য দৈনিক কর্মঘন্টা হচ্ছে ২ ঘন্টার একটি শিফট। শুরু এবং শেষ মিলিয়ে যা আড়াই থেকে তিন ঘন্টা হওয়ার কথা। জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, রি-রোলিং মিলের নব্বই শতাশেংর বেশী শ্রমিক (৯২%) দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। এক-তৃতীয়াংশের বেশী শ্রমিক (৩৪%) দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ (১৩-১৪) ঘন্টা কাজ করেন, এক-চতুর্থাংশের বেশী শ্রমিক (২৬%) দৈনিক গড়ে এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন এবং এক-ষষ্ঠাংশের বেশী শ্রমিক (১৬%) দৈনিক পনের (১৫) ঘন্টা বা তার অধিক সময় কাজ করেন। নব্বই শতাংশের বেশী শ্রমিককে (৯৬%) দৈনিক গড়ে দুই (২) থেকে পাঁচ (৫) শিফট পর্যন্ত কাজ করতে দেখা যায়। অর্ধেকের বেশী শ্রমিক (৫৮%) দৈনিক ন্যুনতম তিন (৩) শিফট কাজ করেন এবং এক-

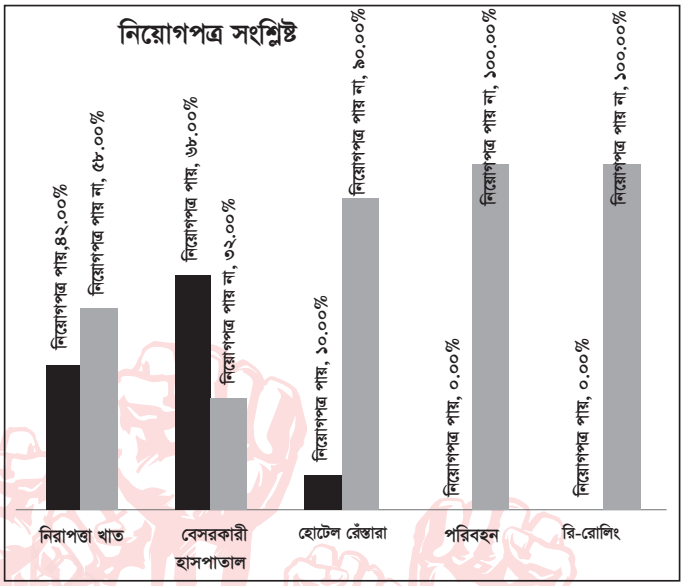

৪ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও মালিক সংগঠনের মতে কারখানার সংখ্যা ৩৫০ এর অধিক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০০। এদের মাঝামাঝি একটি গ্রহণযোগ্য সংখ্যা এখানে গ্রহন করা হয়েছে।

চতুর্থাংশের বেশী (২৬%) দৈনিক গড়ে চার (৪) শিফট কাজ করেন। তাছাড়া, প্রায় অর্ধেকাংশ শ্রমিক (৪৪%) দৈনিক গড়ে দুটি (২) কারখানায় কাজ করেন এবং এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি দৈনিক গড়ে তিনটি (৩) কারখানায় কাজ করেন। রি-রোলিং মিলের স্বাভাবিক কর্ম ঘন্টা হচ্ছে রাত্র এগারটা থেকে সকাল দশ টা। শ্রমিকদের কোন সাপ্তাহিক বা সরকারী ছুটি নেই। মে দিবসেও কারখানা খোলা থাকে এবং তাদেরকে কাজ করতে হয়। আকস্মিক ছুটি পেলে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৩৪%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (৩৪%, একটু ঘুমিয়ে নেন (১৪%) কিংবা প্রয়োজনীয় অন্যন্য কাজ সারেন (১০%)। শ্রমিকেরা সাপ্তাহিক ভাবে মজুরী আয় করেন। মাসিক মজুরী গড়ে দশ হাজার টাকা (১০,০০০) থেকে পনের হাজার (১৫,০০০) টাকার মধ্যে (৮৮%)।

রি-রোলিং কারখানার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৫৪%) শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত। গুণগত তথ্য বিশেষনে দেখা যায়, এ সকল ট্রেড ইউনিয়ন মূলত অনানুষ্ঠানিক ও সেক্টরাল ফেডারেশন ভিত্তিক। আশির দশকে ৮-১০ টি কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের কথা জানা গেলেও বর্তমানে কোন কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের কথা জানা যায়নি। মালিকপক্ষের শক্তিশালী সংগঠন থাকলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ততা স্বাভাবিকভাবে নেয়া হয় না। *(সূত্র: বিল্‌স গবেষণা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত)*

৫. বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক/ ডায়াগনিস্টিক সেন্টার/প্যাথলজি ল্যাব

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে আনুমানিক সাড়ে সাত হাজার বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে। এদের মধ্যে ২,৭১৮ টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং ৪,৫৯৮ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। মোট কর্মরত শ্রমিকের কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী (৬৮%) নারী। এক-তৃতীয়াংশের বেশী (৩৪%) এইচ, এস, সি বা তদুর্দ্ধ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

এ খাতে কর্মরত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২%) শ্রমিকের কোন নিয়োগপত্র নেই। এক-তৃতীয়াংশের (৪২%) বেশী শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। যারা আট ঘন্টার বেশী কাজ করে তাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের বেশী (২৮%) দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭২%) শ্রমিকের মে দিবসে কোন ছুটি নেই। পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) শ্রমিককে সরকারী ছুটির দিনে কাজ করতে হয়। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২%) শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। ছুটির দিনে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৬৪%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (২২%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (৮%), সিনেমা দেখেন (৪%), এবং প্রয়োজনীয় অন্যন্য কাজ সারেন (৪%)।

এ খাতে কর্মরত শ্রমিকরা মাসিক ভাবে মজুরী পান। মাসিক মজুরী গড়ে সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে (৮০%)। এক-তৃতীয়াংশের বেশী শ্রমিক (৩৮%) মাসিক দশ থেকে বার হাজার পাঁচশত টাকা মজুরী পান এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশের (৩২%) মাসিক মজুরী বার হাজার পাঁচশত টাকা থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে। এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মে দিবস ও শ্রমিকের জীবনমান

মূলত কর্মঘন্টাকে আট ঘন্টায় নামিয়ে আনার দাবীতেই মে দিবসের আন্দোলনের সূচনা, যা পরবর্তীতে বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। তবে যে চেতনা নিয়ে মে দিবসের সূচনা হয়েছিল সে চেতনার আলোকে শ্রমিকের আট ঘন্টা কাজের অধিকার আজও বাংলাদেশের অনেক কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষেত্রে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্রমিক আট ঘন্টার অধিক কাজ করেও কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় না। নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য সমাজে এখনো বিদ্যমান। একই ধরণের কাজ করা সত্ত্বেও নারী শ্রমিককে তার সম মজুরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে গৃহকর্মীরা। একই অবস্থা কৃষিশ্রমিক, মৎস্যশ্রমিক, চাতাল, নির্মাণ, জাহাজভাঙ্গা, রিরোলিং খাত, নিরাপত্তাকর্মী, পরিবহন শ্রমিকসহ

আরও অন্যান্য খাতের শ্রমিকের ক্ষেত্রে। গৃহশ্রমিকের জন্য নেই নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা। নির্মাণ সেক্টরে যে সকল নারী শ্রমিক পুরুষের সমান কাজ করে তাদেরকে সমান মজুরি দেয়া হয় না। দিনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় কাজ করেও গৃহকর্মীরা ন্যায্য মজুরি, ছুটি, বিশ্রাম ও বিনোদন সুবিধা পায়না। গার্মেন্টস সেক্টরে মজুরি পরিশোধ নিয়ে হাঙ্গামা নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার অধিক কাজের চাপ শ্রমিকের জীবনযাত্রার ওপর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে থাকে, যা তাকে করে তোলে জীবনবিমুখ, যান্ত্রিক। কর্মঘন্টার অধিক দীর্ঘমেয়াদী কাজের চাপ একজন শ্রমিককে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে তার পারিবারিক জীবন, পারিপার্শ্বিকতা, জনসমষ্টি এমনকি সমাজ থেকে, যার প্রভাব পড়ে তার পরিবারের সদস্যদের ওপর এবং সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ তার ক্রমেই কমতে থাকে। ফলে সে হয়ে পড়ে জীবনবিমুখ এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ কমতে থাকে।

শ্রমিকের রাজনৈতিক জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা এবং বিশ্রামহীনতা। শ্রমিক অধিকার রক্ষায় সংগঠিত হওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড, রাজনৈতিক সচেতনতা সকল ক্ষেত্রেই সম্পৃক্ততার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হতে থাকে, যা শ্রমিককে সুস্থ রাজনৈতিক জীবন থেকে দুরে ঠেলে দিতে থাকে। এর ফলে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে দুরত্ব বাড়তে থাকে, শ্রম অসন্তোষ ও আন্দোলনে যা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

এ তো গেল কর্মঘন্টা ও মজুরির খন্ডিত চালচিত্র। মালিকের সাথে শ্রমিকের দরকষাকষির যে প্রধান হাতিয়ার অর্থাৎ নিজেদের পছন্দমত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের আইএলও স্বীকৃত যে চিরন্তন অধিকার দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে সেটাও নাজুক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নব্য মালিক শ্রেনী ট্রেড ইউনিয়নকে উৎপাদনের প্রধান অংশীদার না ভেবে শ্রমিকদেরকে প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবছে, যার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠিত হওয়ার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান, অইএলও কনভেনশন ও শ্রম আইনে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মালিকরা বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হওয়া প্রয়োজন।

শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই কাজের অনুকুল নয়। প্রতিবছর অনেক অমূল্য জীবন শুধু কর্তপক্ষের অবহেলার কারণে ঝরে যায়। ২০১৬ সালে টাম্পাকো ফয়েল ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে সৃষ্ট অগ্নিকান্ডে ঝরে গেল ৩৯ জন শ্রমিকের প্রাণ। ক্ষতিগ্রস্থ হল প্রতিবেশীরা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বয়লার বিস্ফোরণে নিহত হল আরও ১৬ শ্রমিক। সারাদেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৬৯৯ শ্রমিক আর আহত হয়েছে ৭০৩। অথচ মালিকদের এ কারণে কোন দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি হচ্ছে না। সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েই তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরী।

মহান মে দিবস ও শ্রমিকদের আইনগত সুরক্ষা

১৮৮৬ সাল থেকে আট ঘন্টা শ্রমিকদের 'কর্মঘন্টা' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে যা বর্তমানে শ্রমিকদের আইনগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১০০ ধারায় আট ঘন্টা কাজের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অথচ প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময়। দু:খজনক হলেও সত্য, দেশের সকল শ্রমিক শ্রম আইনের আওতাভুক্ত নয়। তাই শ্রমিকদের অধিকার যা শ্রম আইন দ্বারা সুরক্ষিত তার সুবিধা দেশের সিংহভাগ শ্রমিক ভোগ করতে পারছে না। দেশের শ্রম আদালত শ্রম আইন দ্বারা গঠিত বলে এর এখতিয়ার কেবল শ্রম আইনের আওতাভুক্তদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য শ্রমিকের এই আদালত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আবার, শ্রম আইনের ৫ ধারায় শ্রমিক নিয়োগের সময় নিয়োগ পত্র এবং নিয়োগকৃত শ্রমিকদের ছবিসহ পরিচয় পত্র প্রদানের বিষয়ে নিয়োগকারীদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলেও শ্রম আইনভুক্ত অল্প সংখ্যক শ্রমিকই নিয়োগ পত্র ও পরিচয় পত্র পেয়ে থাকে। এদিকে, নিয়োগ পত্র ও পরিচয় পত্র না থাকলে শ্রম আদালতে মামলাও দায়ের করা যায় না। ফলে প্রতিনিয়ত বঞ্চনার সম্মুখীন হচ্ছে শ্রমিকগণ।

আবার, শ্রম আদালতের সংখ্যা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সারাদেশে মাত্র সাতটি- ঢাকায় তিনটি, চট্টগ্রামে দুইটি এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে একটি করে শ্রম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকায় রয়েছে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল। দেশে শিল্প কারখানা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শ্রমিক সংখ্যা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ফলে শ্রম আদালতসমূহের উপর চাপ পড়ছে। ৬০ দিনে মামলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মামলা অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকছে বছরের পর বছর। আর, শ্রমিকের কর্মস্থল থেকে শ্রম আদালতের দুরত্ব বেশি থাকায় প্রতিকার চাইতে শ্রমিক শ্রম আদালতে আসতেই পারেনা।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শোভন কাজ প্রাপ্তি শ্রমিকের অধিকার। মালিক-নিয়োগকারী শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ প্রদান করবেন এটি শ্রম আইনের ৭৮(ক) ধারায় রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শ্রমিকগণ কি তা পান? অথচ এই সুরক্ষা উপকরণের অভাবে অনেক শ্রমিক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র যেমন- জাহাজ ভাঙা, রিরোলিং মিল, সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করা ইত্যাদি কাজে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা কতটুকু তা রানা প্লাজা ভবন ধস, তাজরীন গার্মেন্টস অগ্নিকান্ড বা সাম্প্রতিক টাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় শ্রমিকরা জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। কারখানা প্রতিষ্ঠায় ন্যূনতম যে বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয় তাও মানা হচ্ছে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। আর, দুর্ঘটনায় আহত-নিহত হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত? বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মাত্র! ২০০৬ সাল থেকে আজ আমরা ২০১৭ সালে পৌঁছেছি। দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, বাসাভাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল খাতে ব্যয় বেড়েছে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের বেতন বেড়েছে অথচ শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০০৬ সালে যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে!

জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পাওয়া, পরবর্তী মাসের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের অধিকার। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, মজুরি বৃদ্ধির দাবি করলে শ্রমিকদেরকে চাকুরি থেকে ছাঁটাই হতে হয়। দফায় দফায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়লেও বাড়েনি শ্রমিকদের মজুরি। শ্রমিকদের নেই চাকুরির নিশ্চয়তা। ছুটি, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লংঘিত হচ্ছে পদে পদে। যখন তখন বরখাস্ত হবার ভয়ে ন্যায্য দাবি উত্থাপনও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। শ্রমিক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি জানিয়ে এলেও অদ্যাবধি তা নির্ধারণে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কৃষক ও শ্রমিককে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে। এছাড়াও সকল নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার রয়েছে সংবিধানে যা শ্রমিকদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার, উপযুক্ত মজুরি প্রদান ও জবরদস্তি শ্রম থেকে রক্ষা করার।

শ্রমিকদের সার্বিক সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীনতার পর পরই প্রণীত হয়েছিল 'শ্রমনীতি'। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার এই দলিল পরবর্তীতে সংশোধিত হয়েছে যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ শ্রমনীতি ২০১২' হিসেবে বলবৎ রয়েছে। শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত সকল আইনের সমন্বয় করে ২০০৬ সালে প্রণীত হয় 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' যা ২০১৩ সালে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০১৫ সালে প্রণয়ন করা হয় 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫'। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর করেছে যার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকার ২০১৩ সালে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩'এবং ২০১৫ সালের ২১ ডিসেম্বর দেশে কর্মরত লক্ষ লক্ষ গৃহশ্রমিকের সুরক্ষায় প্রণয়ন করেছে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫'। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসাসহ নির্ধারিত বিভিন্ন খাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়। কিন্তু উপরোক্ত আইনগত অধিকার শ্রমিকদের জন্য কতটুকু নিশ্চিত করা গেছে, আজ মে দিবসের দিনে শ্রমিকদের অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

বিল্‌স কার্যক্রম

- **মে দিবস পদকঃ** বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স-এর উদ্যোগে দেশের শ্রমিক আন্দোলনে উলেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন সময়ে মে' দিবস পদক প্রদান করে। যারা বিভিন্ন সময়ে পদক প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মরহুম রুহুল আমিন কায়সার (মরণোত্তর), মরহুম আব্দুর রহমান (মরণোত্তর), মরহুম চৌধুরী হারুনর রশীদ, মরহুম ইস্কান্দর আলী (মরণোত্তর), সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, মরহুম প্রতাপ উদ্দিন আহমেদ (মরণোত্তর), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ, মরহুম রুহুল আমিন ভূঞা (মরণোত্তর), মরহুম শেখ রওশন আলী (মরণোত্তর), মরহুম আবুল বাশার, সফিকুর রহমান মজুমদার, মরহুম গোলাম মহিউদ্দিন, নাসিম আলী, অনিল মুখার্জী, মোঃ শাহজাহান, দেওয়ান সিরাজুল হক, আব্দুল মান্নান, এ আর সুন্নামত, মোঃ আশরাফ হোসেন ও মোঃ মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

- **মে দিবসে স্মারক বক্তৃতাঃ** মহান মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিল্‌স এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর মে দিবস স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। দেশের শ্রমজীবী মানুয়ের কল্যাণে নিয়োজিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে মে দিবসের সত্যিকারের চেতনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলনের করণীয় কী সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতেই এ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। এপর্যন্ত বিল্‌স আয়োজিত মে দিবসের স্মারক বক্তৃতায় কামাল লোহানী, শেখর দত্ত, এম এম আকাশ, মঞ্জুরুল আহসান খান সহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে বিল্‌সের এই আয়োজনকে সমৃদ্ধ করেছেন।

- **স্মারক বক্তৃতা সংকলনঃ** দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে মে দিবসের চেতনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলনে করণীয় বিষয়ের দিক নির্দেশনার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর মহান মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বক্তৃতার সংকলন করে মে দিবসের স্মারক বক্তৃতা সংকলন প্রকাশ করা হয়।

সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিল্‌স এর অনুষ্ঠান

উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা, সেমিনার, স্টল, ইনস্টলেশন, শোভাযাত্রা সহ বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমে প্রতি বছর বিল্‌স অংশগ্রহণ করে। এ সকল অনুষ্ঠানে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বিল্‌স নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে শ্রম পরিস্থিতি, অর্থনীতি, শ্রম আইন, শ্রম অধিকার, কনভেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা, শোভন কাজ, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিল্‌স প্রকাশনা : মহান মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিল্‌স প্রতি বছর শুভেচ্ছা কার্ড, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ করে।

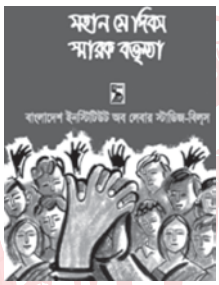

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সাথে বিল্‌স যৌথভাবে ট্রাক র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনা সভা সহ বর্ণিল কর্মসূচির আয়োজন করে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় গৃহশ্রমিকদের অধিকার, সচেতনতা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের পক্ষ থেকে মহান মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের পক্ষ থেকে মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মহান মে দিবস উদ্‌যাপনে বিল্‌সের চট্টগ্রাম অফিস এবং খুলনা অফিস থেকে র‍্যালি, আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সম্পাদক: সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, সহযোগী সম্পাদক: মোঃ ইউসুফ আল-মামুন, সহকারী সম্পাদক: ফারিবা তাবাসসুম, সম্পাদকীয় সহকারী: মামুন-অর-রশিদ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net